HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ০১ কৃষিকার্যের ভৌগোলিক নিয়ামক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: কৃষিকার্যের ভৌগোলিক নিয়ামক
টপিক ০২: ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ
টপিক ০৩: গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ
টপিক ০৪: আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ
টপিক ০৫: চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ
টপিক ০৬: কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ
টপিক ০৭: বাংলাদেশের প্রধান কৃষিক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ
টপিক ০৮: বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান
টপিক ০৯: বাংলাদেশের কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি
টপিক ১০: ঋতুভিত্তিক ফসল ও বাংলাদেশের জলবায়ু
টপিক ১১: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১২: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

কৃষিকার্যের ভৌগোলিক নিয়ামক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কৃষিকার্যের ভৌগোলিক নিয়ামক

কৃষিকাজের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Agriculture, শব্দটি আবার দুটি ল্যাটিন শব্দ 'Agros' এবং 'Cultura'-এর সমন্বয়ে গঠিত। 'Agros' অর্থ মাটি বা ভূমি এবং 'Cultura' শব্দের অর্থ চাষ করা। অর্থাৎ ভূমিকর্ষণ বা চাষ করার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করাকেই কৃষি বলে। কৃষি মানুষের আদিমতম পেশা এবং উন্নয়নের মূলভিত্তি।

কৃষির সংজ্ঞা: মানুষের প্রাচীনতম পেশাকে বিভিন্ন কৃষি বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

'কৃষি হলো ভূমি চাষাবাদের বিজ্ঞান ও শিল্প।'- R.L. Kohen.

'Agriculture is a science, industry and business'. G.O Brrayen.

'কৃষি হলো এক ধরনের সৃষ্টি সম্পর্কিত কর্ম, যা সেচ কৌশলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়'- অধ্যাপক এ. আর. খান।

কৃষিকাজের উপর প্রভাব বিস্তারকারী ভৌগোলিক উপাদানসমূহকে মূলত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

কৃষিকার্যের ভৌগোলিক নিয়ামক

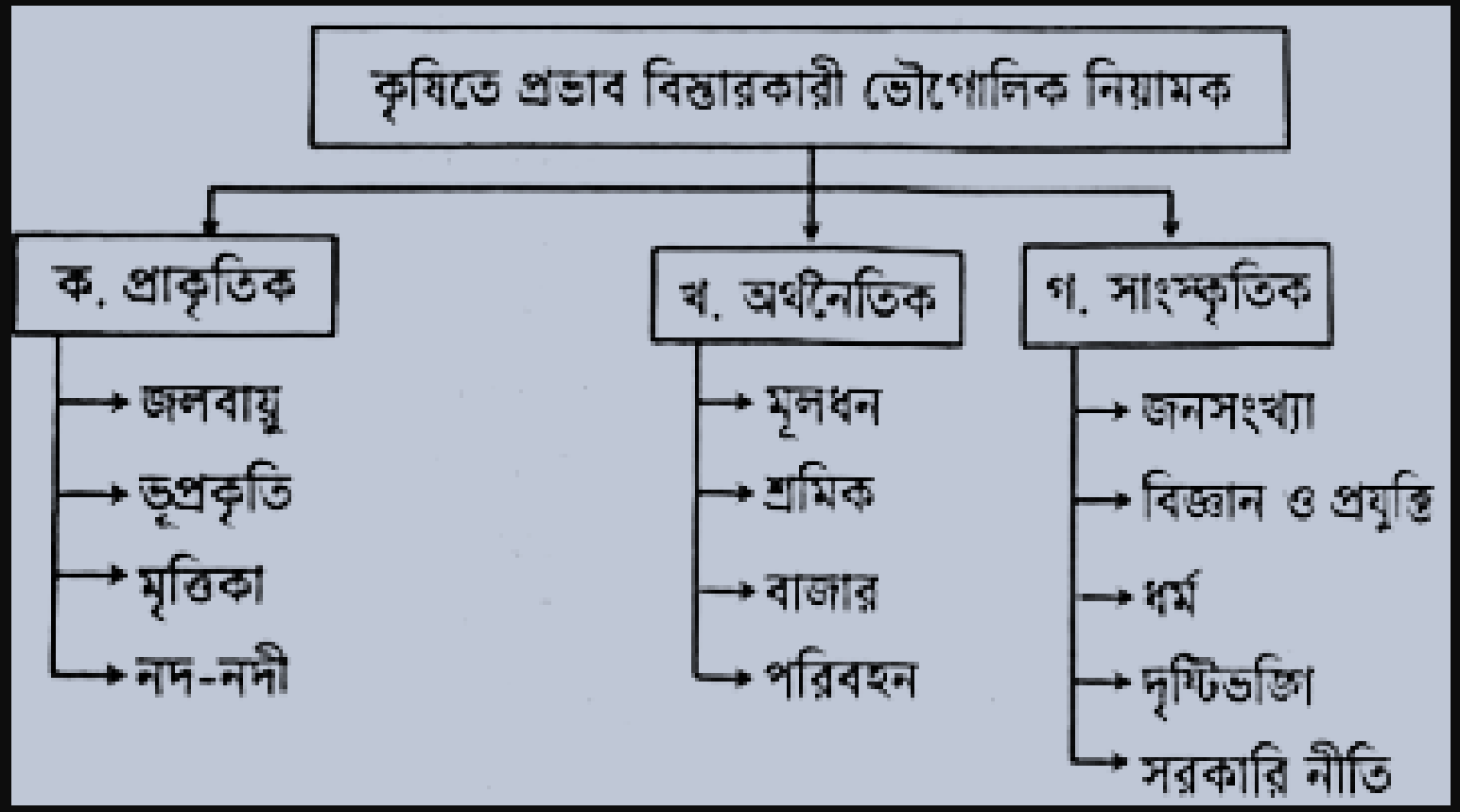

কৃষিকার্যের ভৌগোলিক নিয়ামক

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক (Physical Factors): কৃষিকাজের প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ হচ্ছে

১. জলবায়ু: কৃষিকাজ জলবায়ুর ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি পদ্ধতি জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধান ক্রান্তীয় মৌসুমি (বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড) অঞ্চলে ভালো হয়।

তাপমাত্রা: প্রতিটি কৃষি ফসলের জন্য একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ছাড়া ফসলের উৎপাদন সম্ভব নয়। তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। যেমন- ধান ও গম উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে ১৬-৩০ ডিগ্রি এবং ১৬-২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাত: কৃষিকাজে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন অত্যধিক। পানি ছাড়া উদ্ভিদের জন্ম ও বিকাশ লাভ সম্ভব হয় না। আবার সব ধরনের ফসলের জন্য একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত প্রযোজ্য নয়। যেমন- ১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ধান চাষ ভালো হয়।

আর্দ্রতা: আর্দ্রতার উপর ফসলের জন্ম ও বৃদ্ধি নির্ভরশীল। আর্দ্রতাপূর্ণ অঞ্চলে কৃষিকাজের উন্নতি হয়। যেমন-থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ। আর্দ্রতাহীন শুষ্ক অঞ্চলে কৃষিকাজ সম্ভব নয়। যেমন- সাহারা মরুভূমি অঞ্চল।

কৃষিকার্যের ভৌগোলিক নিয়ামক

বায়ুপ্রবাহ: বায়ুপ্রবাহ উদ্ভিদের পরাগায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও বৃষ্টিপাত সংঘটনে বায়ুপ্রবাহের ভূমিকা আছে। যেমন- ধান ও গমের পরাগায়ণ বায়ুর মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

২. ভূপ্রকৃতি: ভূমির অবস্থা এবং সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতার ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ফসল জন্মে। সমতল ভূমিতে যত নিবিড়ভাবে কৃষিকাজ করা যায়, পাহাড়ি অঞ্চলে তা সম্ভব হয় না। কৃষির ওপর ভূপ্রকৃতির ভূমিকা তাই অনেক বেশি। যেমন- পাহাড়ি ঢালু জমিতে চা, কফি, রাবার প্রভৃতি এবং সমতল ভূমিতে ধান, পাট, সরিষা ভালো হয়।

৩. মৃত্তিকা: উর্বর মৃত্তিকায় ভালো ফসল জন্মে, আবার অনুর্বর মৃত্তিকায় তা সম্ভব হয় না। মৃত্তিকার ধরন ভেদেও ফসল উৎপাদনে ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন- বাংলাদেশের উর্বর পলি-দোআঁশ মৃত্তিকায় ধান ভালো জন্মে।

৪. নদ-নদী: নদ-নদী পানির অন্যতম প্রধান উৎস। তাছাড়া পলি সঞ্চয়ের কারণে নদীর দুই তীরের মৃত্তিকা উর্বর হয়ে ওঠে। ফলে নদী অববাহিকা অঞ্চলে ব্যাপক কৃষিকাজ হয়ে থাকে।

খ. অর্থনৈতিক নিয়ামক (Economic Factors): কৃষিকাজের ওপর অর্থনৈতিক নিয়ামকের প্রভাব অপরিসীম।

১. মূলধন: চাষের জন্য ট্রাক্টর, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি, পরিবহন ব্যয় প্রভৃতি বাবদ অনেক অর্থ প্রয়োজন হয়। পর্যাপ্ত মূলধন ছাড়া তাই কৃষিকাজ সম্ভব নয়।

কৃষিকার্যের ভৌগোলিক নিয়ামক

২. শ্রমিক: বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশসমূহ কৃষিকাজের জন্য এখনো শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে থাকে। জমি চাষ, সেচ প্রদান, ফসল সংগ্রহ, মাড়াই করা প্রভৃতি কাজের জন্য অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তাই সময়মতো পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া গেলে কৃষিকাজ ভালো হয়।

৩. পরিবহন: উৎপাদিত পচনশীল ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য উন্নত ও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সময়মতো ফসল বাজারজাতকরণ করা না গেলে উৎপাদনের কোনো মূল্য থাকে না।

৪. বাজার: আধুনিক বাজারব্যবস্থা কৃষি উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর যে অঞ্চলে যে পণ্যের চাহিদা বা বাজার থাকে, সে অঞ্চলে সেই ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয়। যেমন- শ্রীলংকায় চা, মালয়েশিয়ায় রাবার চাষ।

কৃষিকার্যের ভৌগোলিক নিয়ামক

গ. সাংস্কৃতিক নিয়ামক (Cultural Factors): কতিপয় সাংস্কৃতিক উপাদানের উপরও কৃষিকাজ নির্ভর করে। যেমন-

১. জনসংখ্যা: কোনো স্থানে জনসংখ্যা বেশি হলে কৃষিপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে পণ্য উৎপাদনের তাগিদ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, জনসংখ্যা কম থাকলে কম চাহিদার কারণে কৃষিপণ্য কম উৎপাদিত হয়।

২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: আধুনিক কৃষি অনেকাংশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকায় তারা কৃষিতে অনগ্রসর। যেমন- মালদ্বীপ, বাংলাদেশ। অপরপক্ষে, ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন, যন্ত্রের সাহায্যে চাষাবাদ ও সেচ প্রদান, ফসল মাড়াই করা প্রভৃতি কাজে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নত দেশসমূহ কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করছে। যেমন- চীন, জাপান।

৩. দৃষ্টিভঙ্গি: মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কৃষিজ উৎপাদনকে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন- উন্নত দেশের কৃষকদের মূল লক্ষ থাকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ। তারা সেই অনুযায়ী ফসল চাষ করে থাকে। পক্ষান্তরে, দরিদ্র দেশসমূহের কৃষকেরা সর্বাগ্রে নিজেদের জীবনধারণের জন্য পণ্য উৎপাদন করে থাকে।

৪. সরকারি নীতি: একটি দেশের কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন ও প্রসার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতির ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। যেমন: বাংলাদেশ সরকার সারের উপর ভর্তুকি দিয়ে থাকে। আবার অনেক সময় দেশীয় উৎপাদন রক্ষা করতে বিদেশে কম মূল্যে পেলেও কৃষিপণ্য আমদানি করা হয় না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ০২ ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

ধান Oryza বর্গের তৃণজাতীয় দানাদার ফসল। এর বৈজ্ঞানিক নাম Oryza sativa। এটা পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য (১ম গম)।

ধান চাষের অনুকূল ভৌগোলিক উপাদান

বিভিন্ন প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান ধান চাষের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। যেমন-

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

ক. প্রাকৃতিক উপাদান: যেসব প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর ধান চাষের সাফল্য নির্ভর করে সেগুলো হলো-

১. ভূপ্রকৃতি: উচ্চভূমি অপেক্ষা সমতল ও নিম্নভূমি ধান চাষের উপযোগী। বিশ্বের প্রায় ৯০ ভাগ ধান নদী গঠিত প্লাবন সমভূমি এবং বদ্বীপ সমভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। যেমন- দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে ধানের চাষ করা হয়। যেমন- জাপান।

২. জলবায়ুঃ ধান চাষে জলবায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জলবায়ুর উপাদানগুলোর মধ্যে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ এ দুটি উপাদানের ওপর ধান চাষের উৎপাদন নির্ভর করে।

i. বৃষ্টিপাত: ধান চাষের জন্য বার্ষিক গড় ১০০-২৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাতের দরকার। তবে যেসব স্থানে বৃষ্টিপাত ১৭৫-২২৫ সে.মি. সেসব স্থানে ধানের ফসল ভালো হয়।

ii. তাপমাত্রা: ধান চাষের জন্য সাধারণত ১৬০-৩০° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন। ধান বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য ১৬° সে. অপেক্ষা অধিক তাপমাত্রা প্রয়োজন। চারা বৃদ্ধিকালীন সময় তাপমাত্রা ২২০-২৪° সে. মধ্যে থাকা আবশ্যক। বিশ্বের প্রায় ৯৫ শতাংশ ধান উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

iii. বায়ুপ্রবাহ: বায়ুপ্রবাহ ফসলের পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া প্রবাহমান বাতাস মৃত্তিকার নাইট্রোজেনের স্বল্পতা দূর করতে সহায়তা করে।

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

৩. মৃত্তিকা: পলিযুক্ত উর্বর এঁটেল-দোঁআশ মাটি ধান চাষের জন্য সর্বাধিক উপযোগী। কারণ এ ধরনের মাটি অধিক পরিমাণ পানি ধারণ করে রাখতে সক্ষম।

৪. পানির সান্নিধ্য: ধানের জমিতে পানির ঘাটতি হলে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যায় না। তাই নদী, হ্রদ, বিল, ঝিল প্রভৃতি অঞ্চলে ধানের চাষ বেশি হয়ে থাকে। তাছাড়া স্বল্প বৃষ্টিযুক্ত বা শুষ্ক অঞ্চলে নদী থেকে সেঁচের মাধ্যমে ধানের চাষ করা হয়। যেমন- সিন্ধু ও নীল নদ অববাহিকার ধান চাষ।

খ. অর্থনৈতিক উপাদান: ধান চাষের জন্য নিচের অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর বিশেষ প্রয়োজন হয়।

১.মূলধন: ধান চাষের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক, পশু ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং শ্রমিকের মজুরি প্রদান বাবদ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়।

২.শ্রমিক: ভূমি চাষ, বীজ বপন, চারা রোপণ, আগাছা পরিষ্কার, ধানকাটা, মাড়াই করা প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

৩.পরিবহন: ধান চাষের জন্য শ্রমিক, যন্ত্রপাতি, বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহ এবং উৎপাদিত ধান বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের জন্য উন্নত ও সুলভ পরিবহনের প্রয়োজন হয়।

৪.বাজার: অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার ধান উৎপাদনের জন্য আবশ্যক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে ধানের বাজার থাকায় বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ ধান এ অঞ্চলে উৎপাদিত হয়।

গ. সাংস্কৃতিক উপাদান: সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি, শিক্ষা ও সরকারি উদ্যোগ প্রভৃতি ধান চাষে বিশেষ প্রভাব ফেলে। ধান চাষের উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত প্রয়োজন।

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

বিশ্বব্যাপী ধান-এর উৎপাদন, বণ্টন এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব
(Worldwide Production, Distribution and Economic Importance of Rice)

ধান প্রধানত মৌসুমি অঞ্চলের ফসল। জনবহুল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হয়ে থাকে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব চীন, জাপান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে বিশ্বের প্রায় ৯০% ধান উৎপন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অববাহিকা, ইতালির পো নদী অববাহিকা, দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনকো নদী অববাহিকা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ধান উৎপাদক অঞ্চল। FAO এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বে মোট ৭,৯৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হয়।

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

পৃথিবীর প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ (Major Rice Producing Countries)

দেশের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ
চীন	২০৮১
ভারত	২০৬৭
বাংলাদেশ	৫৮৬
ইন্দোনেশিয়া	৫৪০
ভিয়েতনাম	৪৩৫
থাইল্যান্ড	৩৩১
মিয়ানমার	২৫৭
ফিলিপাইন	২০০
পাকিস্তান	১৪৮
ব্রাজিল	১০৬
সমগ্র বিশ্ব	৭,৯৯৯

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

১.চীন: ধান উৎপাদনে চীন বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকারী দেশ। চীনের হোয়াংহো, ইয়াং সিকিয়াং ও সেচুয়ান অববাহিকা এবং হুনান প্রদেশে প্রচুর ধান জন্মে। হুনান প্রদেশে অত্যধিক ধান উৎপন্ন হয় বলে একে 'ধানের আধার' (Rice Bowl) বলা হয়।

মানচিত্র- ৪.১: পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

২. ভারত: ধান উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়। দেশটির আসাম, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়।

৩. বাংলাদেশ: বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা অঞ্চল ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের জেলাসমূহে সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়।

৪. ইন্দোনেশিয়া: ধান উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়ার স্থান বিশ্বে চতুর্থ। এ দেশের জাভা অঞ্চল ধান উৎপাদনে প্রসিদ্ধ।

৫. ভিয়েতনাম: ধান উৎপাদনে ভিয়েতনামের স্থান বিশ্বে পঞ্চম। দেশটির মেকং নদীর বদ্বীপ অঞ্চল ও উত্তর ভিয়েতনামের লোহিত অববাহিকায় প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়।

৬. থাইল্যান্ড: ধান উৎপাদনে থাইল্যান্ড বর্তমান বিশ্বে ষষ্ঠ। থাইল্যান্ডের সর্বত্রই ধানের চাষ হয়। তবে মেনাব নদীর অববাহিকা ও বদ্বীপ অঞ্চলেই বেশি ধান জন্মে।

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

৭. মিয়ানমার; ধান উৎপাদনে মিয়ানমারের স্থান বিশ্বে সপ্তম। ইরাবতী নদীর বদ্বীপ ভূমি এ দেশের ধান উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল।

৮. ফিলিপাইন: ধান উৎপাদনে ফিলিপাইনের স্থান বর্তমানে বিশ্বে অষ্টম। ফিলিপাইনের সুজন দ্বীপের সমভূমি ও সোপান ভূমি ধান উৎপাদনে প্রসিদ্ধ।

৯. পাকিস্তান; ধান উৎপাদনে দেশটির স্থান নবম। দেশটির নিম্ন সিন্ধু অববাহিকা, পাঞ্জাব সমভূমি, পেশোয়ার উপত্যকা, পশ্চিম কাশিশ্মর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। পাকিস্তানের সুগন্ধিযুক্ত 'বাসমতি' চাল পৃথিবী বিখ্যাত।

১০. ব্রাজিল: ব্রাজিল বিশ্বের দশম ধান উৎপাদনকারী দেশ। দেশটির মধ্যভাগে বিস্তৃত কৃষিভূমিতে ধান চাষ হয়।

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

ধানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade of Rice)

বিশ্বের কোনো দেশই সরাসরি ধান আমদানি বা রপ্তানি করে না। ধান থেকে চাল তৈরি করে বিশ্ববাজারে প্রেরণ করা হয়। বিশ্বে চাল রপ্তানিতে ২০২৪ সালে ভারত ১ম, থাইল্যান্ড ২য়, পাকিস্তান ৩য়, ভিয়েতনাম ৪র্থ ও যুক্তরাষ্ট্র ৫ম স্থানে রয়েছে। ২০২৪ সালে বিশ্বের দেশগুলো প্রায় ২৬.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের চাল আমদানি এবং ২৯.৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের চাল রপ্তানি করে। ২০২৪ সালে আমদানিতে চীন ১ম, ফিলিপাইন ২য়, সৌদি আরব ৩য় ও যুক্তরাষ্ট্র ৪র্থ স্থানে রয়েছে।

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

ধানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade of Rice)

বিশ্বের কোনো দেশই সরাসরি ধান আমদানি বা রপ্তানি করে না। ধান থেকে চাল তৈরি করে বিশ্ববাজারে প্রেরণ করা হয়। বিশ্বে চাল রপ্তানিতে ২০২৪ সালে ভারত ১ম, থাইল্যান্ড ২য়, পাকিস্তান ৩য়, ভিয়েতনাম ৪র্থ ও যুক্তরাষ্ট্র ৫ম স্থানে রয়েছে। ২০২৪ সালে বিশ্বের দেশগুলো প্রায় ২৬.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের চাল আমদানি এবং ২৯.৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের চাল রপ্তানি করে। ২০২৪ সালে আমদানিতে চীন ১ম, ফিলিপাইন ২য়, সৌদি আরব ৩য় ও যুক্তরাষ্ট্র ৪র্থ স্থানে রয়েছে।

রপ্তানি বাণিজ্য		আমদানি বাণিজ্য	
দেশের নাম	পরিমাণ	দেশের নাম	পরিমাণ
১. ভারত	১১.৮	১. চীন	১.৯
২. থাইল্যান্ড	৬.৪	২. ফিলিপাইন	১.৯
৩. পাকিস্তান	৪.২	৩. সৌদি আরব	১.১
৪. ভিয়েতনাম	৪	৪. যুক্তরাষ্ট্র	১.০
৫. যুক্তরাষ্ট্র	২.৪	৫. বাংলাদেশ	০.৯৩৯
৬. কম্বোডিয়া	১.৯	৬. ইরাক	০.৭১৭
৭. মিয়ানমার	১.৩	৭. ইথিওপিয়া	০.৬৮৭
৮. ইতালি	০.৯৪	৮. ইরান	০.৬৬৮
৯. চীন	০.৭৮	৯. বেনিন	০.৬৪১
১০. ব্রাজিল	০.৫৬	১০. মালয়েশিয়া	০.৫৭৬
সর্বমোট	২৯.৩	সর্বমোট	২৬.৫

সূত্র: WTE, 2025

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

অনুকূল প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদান ধান উৎপাদনে সহায়ক। বিশ্বের সর্বত্র ধান উৎপন্ন হলেও এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোতে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। ধান আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। কারণ ধান উৎপাদনকারী দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশি থাকায় বিশ্ববাণিজ্যে এর প্রবেশ খুব সীমিত।

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

উন্নয়নশীল বিশ্বে ধান চাষের সমস্যা ও সমাধান
(Problem and Solution of Rice Cultivation in Developing Countries)

উন্নয়নশীল বিশ্বে ধান চাষে কিছু সমস্যা বিরাজমান। সেগুলো হচ্ছে-

১. জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ,
২. মূলধনের অভাব,
৩. ধানের বীজ স্বল্পতা,
৪. মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীলতা,
৫. আধাদক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক,
৬. সনাতন চাষ পদ্ধতি,
৭. উন্নত বীজের অভাব,
৮. সারের ঘাটতি,
৯. পানিসেচের অপর্যাপ্ততা,
১০. ভূমির অত্যধিক চাহিদা,
১১. ভূমির খন্ডীকরণ,
১২. ভূমিহীন কৃষক,
১৩. কীটপতঙ্গের আক্রমণ,
১৪. অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা,
১৫. গুদাম ও পণ্যাগারের স্বল্পতা,
১৬. বাজারজাতকরণের অসুবিধা,
১৭. শক্তি সম্পদের অভাব,
১৮. সমন্বিত কৃষিনীতির অভাব প্রভৃতি।

ধান উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

উন্নয়নশীল দেশের ধান চাষে বিরাজমান সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বেশকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

১. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ,
২. কৃষি ঋণের ব্যবস্থা,
৩. উন্নতমানের বীজ সরবরাহ,
৪. সার ও কীটনাশক সরবরাহ,
৫. সেচব্যবস্থার উন্নতি,
৬. মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা,
৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা,
৮. ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন প্রভৃতি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ০৩ গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ (Factors of Wheat Production)

গম এক প্রকার দানাদার খাদ্যশস্য, যা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের প্রধান খাবার। প্রাচীনকাল থেকে এর বিভিন্নমূখী ব্যবহার চলে আসছে। গম গ্রামিনি গোত্রভুক্ত তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। গমের বৈজ্ঞানিক নাম Triticum aestivum। এর প্রধান জাতগুলোর আদিভূমি পাকিস্তান, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং উত্তর আমেরিকা। পরবর্তীকালে এসমস্ত অঞ্চল থেকে গম সারাবিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ: গম উৎপাদনে বেশ কিছু নিয়ামক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেগুলো হলো:

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক: গম উৎপাদনের প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ নিম্নরূপ:

১. জলবায়ু: গম মূলত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শস্য। গম চাষের আদর্শ তাপমাত্রা হচ্ছে ১৬০-২২°সে.। শস্যটি চাষের প্রাথমিক অবস্থায় তাপমাত্রা কম (১৮°সে.) এবং ফসল পাকার সময় বেশি তাপমাত্রা (২২°সে.) থাকা প্রয়োজন। গম চাষের জন্য অবস্থান অনুসারে বার্ষিক গড়ে ৩০ থেকে ১০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। যেমন- উত্তর আমেরিকার প্রেইরি, রাশিয়া।

২. মৃত্তিকা: কর্দমময় দোআঁশ মৃত্তিকা গম চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। লাভাগঠিত এবং লোয়েস মৃত্তিকাতেও গম চাষ ভালো হয়।

৩. ভূপ্রকৃতি: সমতল ভূমি গম চাষের জন্য উপযোগী। সহজে পানি সরে যেতে পারে এমন সমতল ভূমি গম চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। যেমন- বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমি।

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক: গম চাষের জন্য আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহ নিম্নরূপ:

১. খাদ্যাভ্যাস: বিশ্বের নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান অঞ্চলের এক বিরাট জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য গম। বিশ্বের যেসব অঞ্চলে গমের চাহিদা আছে, সেখানে গমের চাষ বেশি হয়। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র।

২. জনবসতি: জনবসতির ঘনত্ব কম হলে অধিক চাষের জমি পাওয়া যায়। ফলে গম চাষ ভালো হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হলে জমি খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়ায় গম উৎপাদন ভালো হয় না।

৩. কৃষি উপকরণ: বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাপক এলাকায় গম চাষের জন্য আধুনিক ও উন্নত কৃষি উপকরণ-যেমন: ট্রাক্টর, হার্ভেস্টর প্রভৃতি প্রয়োজন।

৪. নগদ অর্থ: উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, যান্ত্রিক পদ্ধতির চাষাবাদ, সেচ প্রভৃতি ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। এ কারণে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল দেশসমূহে গম চাষের প্রসার বেশি হয়। যেমন- চীন, রাশিয়া।

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

৫. সংরক্ষণ সুবিধা: চাল অপেক্ষা গম দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। কার্যকর ও আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গম চাষকে প্রভাবিত করে।

৬. রপ্তানির সুযোগ: খাদ্যশস্যের মধ্যে গমের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বার্ষিক মোট উৎপাদিত গমের ১৫%-২০% বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করে। রপ্তানির এ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, প্রভৃতি দেশ অধিক পরিমাণ গম উৎপাদন করে থাকে।

৭. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা: বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম চাষ করতে হলে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা আবশ্যক। ফলে প্রয়োজনের সময় ভর্তুকি প্রদান করে গমের উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়।

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

বিশ্বব্যাপী গম-এর উৎপাদন, বণ্টন এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব
(Worldwide Production, Distribution and Economic Importance of Wheat)

বিশ্বের প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে চীন, ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, ইউক্রেন প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের প্রায় ৪৫% এশিয়ায়, ৩৩% ইউরোপে, ১১% উত্তর আমেরিকায়, ৪% দক্ষিণ আমেরিকায়, ৪% আফ্রিকায় এবং ৩% অস্ট্রেলিয়ায় উৎপাদিত হয়।

মহাদেশ	উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মেট্রিক টন)
১. এশিয়া	৩৫২৩
২. ইউরোপ	২৬৯৩
৩. উত্তর আমেরিকা	৮১৩
৪. দক্ষিণ আমেরিকা	২৪৭
৫. আফ্রিকা	২৬৩
৬. ওশেনিয়া	৪১৬
সমগ্র পৃথিবী	৭৯৫৫

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

বিশ্বের প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশ (Major Wheat Producing Countries)

বিশ্বের প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশসমূহ নিম্নরূপ:

১. চীন: পৃথিবীর শীর্ষ গম উৎপাদনকারী দেশ চীন। এদেশে শীত ও বসন্তকালীন উভয় প্রকার গম চাষ করা হয়। উত্তর চীনের সমভূমি, ইয়াংসি ও হোয়াংহো নদী অববাহিকা অঞ্চল, সিচুয়ান প্রদেশ প্রভৃতি চীনের প্রধান গম উৎপাদনকারী অঞ্চল। FAO এর তথ্যমতে, বিশ্বের মোট গম উৎপাদনের প্রায় ১৮% চীনে উৎপাদিত হয়।

২. ভারত: বিশ্বের অন্যতম প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে ভারত। দেশটি গম উৎপাদনে ২য় স্থানের অধিকারী। ভারতের উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে ভালো গম উৎপাদিত হয়। ভারতে মূলত শীতকালীন গম বেশি উৎপন্ন হয়।

৩. রাশিয়া: দেশটি গম উৎপাদনে ৩য় স্থানে রয়েছে। রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে বসন্তকালীন গম উৎপাদিত হয়। রাশিয়ার উৎপাদিত গম উৎকৃষ্ট মানের।

৪. যুক্তরাষ্ট্র: যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম প্রধান গম উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ। গম উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ৪র্থ। যুক্তরাষ্ট্রে শীত ও বসন্তকালীন গম উৎপাদিত হয়ে থাকে। দেশটির মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে গম উৎপাদন বেশি হয়।

৫. অস্ট্রেলিয়া: গম উৎপাদনে দেশটি বিশ্বে পঞ্চম। দেশটির ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া ও কুইন্সল্যান্ড প্রভৃতি প্রদেশে প্রচুর গম উৎপাদন হয়।

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

৬. ফ্রান্স: গম উৎপাদনে ফ্রান্স বিশ্বে ষষ্ঠ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। দেশটির অধিকাংশ গমই পশ্চিমাঞ্চলে এবং পার্সিয়ান অববাহিকায় উৎপাদিত হয়।

৭. কানাডা; গম উৎপাদনে কানাডা বিশ্বে সপ্তম। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে চাষাবাদ করায় কানাডায় গম উৎপাদন অনেক বেশি। কানাডার প্রেইরি, আলবার্টা, ম্যানিটোবা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপাদন হয়। কানাডার দক্ষিণ ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর অর্থাৎ উভয় দেশের সীমান্তবর্তী প্রেইরি অঞ্চলজুড়ে এত বেশি গম উৎপাদিত হয় যে, এই অঞ্চলকে 'বিশ্বের রুটির ঝুড়ি' (Bread Basket of the World) বলা হয়।

৮. পাকিস্তান: পাকিস্তান বিশ্বের অষ্টম এবং এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম গম উৎপাদনকারী দেশ। পাকিস্তানের সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে সবচেয়ে বেশি গম উৎপন্ন হয়ে থাকে।

৯. ইউক্রেন: গম উৎপাদনে ইউক্রেন বিশ্বে নবম স্থানের অধিকারী দেশ। দেশটির মধ্য ও দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল গম চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

১০. জার্মানি: জার্মানি বিশ্বের দশম গম উৎপাদনকারী দেশ। দেশটির গম উৎপাদনকারী অঞ্চল ৫টি। রায়ার্ন দেশটির সর্বাধিক গম উৎপাদী অঞ্চল। এছাড়াও নিডারজাখসেন, জাখসেন-আনহান্ট, মেকলেনবুর্গ-ফোপাসেন, নর্ডরাইন-ভেস্টফালেন এ প্রচুর গম উৎপাদিত হয়।

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

মানচিত্র-৪.৩: পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

গমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও বিশ্ববাণিজ্য
(International Trade of Wheat and It's Importance)

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে গম প্রধান খাদ্যশস্য। তবে পশ্চিম গোলার্ধে (পশ্চিমা বিশ্বে) এর চাহিদা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। তবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের আধিক্যের কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সাধারণত গম চাষ হয় না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দানাদার শস্যের মধ্যে গম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বর্তমান বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের প্রায় ১৬ শতাংশ বিশ্ববাজারে প্রবেশ করে। গমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রাশিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্বিলিত অবদান প্রায় ৪৫.৮ শতাংশ। ২০২২ সালে বিশ্বের দেশগুলো প্রায় ৬৬.২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের গম রপ্তানি এবং ৭২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের গম আমদানি করে। সূত্র- FAOSTAT, August, 2023.

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

দেশ	রপ্তানির পরিমাণ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	দেশ	আমদানির পরিমাণ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১. কানাডা	৭.৬	১. ইন্দোনেশিয়া	৩.৬
২. যুক্তরাষ্ট্র	৬	২. চীন	৩.৫
৩. অস্ট্রেলিয়া	৫.৬	৩. ইতালি	২.৮
৪. রাশিয়া	৪.৯	৪. ফিলিপাইন	২
৫. ইউক্রেন	৩.৭৪	৫. স্পেন	১.৯
৬. ফ্রান্স	৩.৭২	৬. আলেজেরিয়া	১.৮
৭. আর্জেন্টিনা	১.৯	৭. জাপান	১.৭
৮. রোমানিয়া	১.৮	৮. ব্রাজিল	১.৬
৯. জার্মানি	১.৭	৯. জার্মানি	১.৪৫
১০. পোল্যান্ড	১.২৩	১০. দ. কোরিয়া	১.৪
সর্বমোট	৬৬.২	সর্বমোট	৭২.৩

গম উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

রপ্তানিকারক দেশ: অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, ইউক্রেন, জার্মানি প্রধান গম রপ্তানিকারক দেশ। দেশগুলো নিজেদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ব বাজারে গম রপ্তানি করে থাকে।

আমদানিকারক দেশসমূহ: গম আমদানিকারক দেশগুলো অনিয়মিতভাবে বা অনির্ধারিতভাবে গম আমদানি করে থাকে।

যেমন- ব্রাজিল, জার্মানি, স্পেন প্রভৃতি দেশে গম আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। আবার আলজেরিয়া, জার্মানিতে কমছে। ২০২৪ সালে প্রধান গম আমদানিকারক দেশের মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, চীন, আলজেরিয়া, ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশ। বিশ্ব বাণিজ্যে গমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাধারণত উন্নত দেশগুলো গম রপ্তানি করে। অন্যদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলো তা আমদানি করে।

পরিশেষে বলা যায়, গমের রপ্তানি মূল্য অন্যান্য খাদ্যশস্য অপেক্ষা অধিক হওয়ায় উৎপাদনকারী দেশগুলো (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য) অনেক ক্ষেত্রে গমকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। আজ পর্যন্ত গম চাষের ওপর যত গবেষণা হয়েছে ততটুকু অন্য কোনো ফসলের জন্য হয়নি। খাদ্যমান বেশি থাকায় বিশ্বে গমের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ০৪ আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

আখ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল। এটি সরু ও লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট হয়। এ কাণ্ডের রস যথেষ্ট মিষ্টি। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ রস থেকে চিনি উৎপাদন করা হয় বলে এর চাষের আওতা সম্প্রসারিত হয়েছে। পৃথিবীর মোট চিনির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ আখ থেকে উৎপন্ন হয় (আন্তর্জাতিক চিনি সংস্থা ISO: 2022)। ভারতীয় উপমহাদেশের মৌসুমি অঞ্চল আখের আদিভূমি। উর্বর দোঁআশ মৃত্তিকা, পরিমিত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত মূলধন ও শ্রমিক সরবরাহ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি আখ চাষের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। আখ এর বৈজ্ঞানিক নাম Saccharum officinarum। আখ চাষের অনুকূল ভৌগোলিক নিয়ামক: আখ চাষ কতগুলো ভৌগোলিক নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত। যেমন-

১. ভূপ্রকৃতি: পানি জমে থাকে না এরূপ উঁচু ও সামান্য ঢালু জমিতে আখ চাষ ভালো হয়।

২. মৃত্তিকা: চুন, পটাশ ও নাইট্রোজেনযুক্ত ও লাভা গঠিত কৃষ্ণ মৃত্তিকা আখ চাষের জন্য উপযোগী। তাছাড়া উর্বর দোআঁশ মৃত্তিকা আখ চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

৩. জলবায়ু: আখ চাষের জন্য ১৯০-২৭০ সে. তাপমাত্রা প্রয়োজন। সাধারণত ১২৫-১৭৫ সে.মি. বৃষ্টিপাতবিশিষ্ট অঞ্চলে আখ ভালো জন্মে। এছাড়া সমুদ্রের লোনা বাতাসের প্রভাবে আখের রসে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উপরিউক্ত নিয়ামকগুলো অনুকূল থাকায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এবং পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকায় আখ চাষের প্রসার ঘটেছে।

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ: আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক উপাদানসমূহ হলো-

১. মূলধন: চারা, সার, কীটনাশক ও চাষের যন্ত্রপাতি ক্রয় ও পরিবহন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর মূলধনের দরকার।

২. শ্রমিক: আখের জমি তৈরি, চারা রোপণ, তত্ত্বাবধান, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, আখ কর্তন প্রভৃতি কাজে প্রচুর দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।

৩. উন্নত পরিবহন: ক্ষেত থেকে আখ দ্রুত চিনিকলে এবং সেখান থেকে বাজারে পাঠানোর জন্য উন্নত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

৪. বাজার: আখ চাষের জন্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির ব্যাপক চাহিদা থাকা আবশ্যক। উপরিউক্ত নিয়ামকগুলো অনুকূল থাকায় চীন, ব্রাজিল, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে আখ চাষের প্রসার ঘটেছে।

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ:

১. সার ও কীটনাশক: জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ এবং রোগবালাই দমন করার জন্য কীটনাশক প্রয়োজন।

২. চিনিকল প্রতিষ্ঠা: আখ চাষ বৃদ্ধির জন্য অধিকসংখ্যক চিনিকল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

৩. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা: আখ চাষের সম্প্রসারণ তথা সার্বিক উন্নতির জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

৪. কৃষি ঋণ: স্বল্প সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা আখ চাষের প্রসার ঘটাতে সহায়তা করে।

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

বিশ্বব্যাপী আখ-এর উৎপাদন, বণ্টন এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব
(Worldwide Production, Distribution and Economic Importance of Sugarcane)

আখ চাষের নিয়ামকগুলো অনুকূল থাকায় ব্রাজিল, চীন, ভারত, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে আখ চাষের প্রসার ঘটেছে। FAO এর তথ্য মতে, ২০২৩ সালে বিশ্বে মোট প্রায় ২০,২৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন আখ উৎপাদিত হয়েছে।

দেশ	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	দেশ	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)
১. ব্রাজিল	৭৮২৬	৬. মেক্সিকো	৫৬০
২. ভারত	৪৯০৫	৭. ইন্দোনেশিয়া	৩৪৭
৩. চীন	১০৫০	৮. অস্ট্রেলিয়া	৩২৬
৪. থাইল্যান্ড	৯৪০	৯. যুক্তরাষ্ট্র	২৯৯
৫. পাকিস্তান	৮৭৬	১০. গুয়েতেমালা	২৬৪
		বিশ্বে মোট	২০২৫৮

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

আখের উৎপাদন ও বণ্টন (Major Sugarcane Producing Countries)

নিচে বিশ্বের প্রধান আখ উৎপাদনকারী দেশগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

১. ব্রাজিল: আখ উৎপাদনে ব্রাজিলের স্থান বিশ্বে প্রথম। দেশটির উত্তর-পূর্ব উপকূলবর্তী নিচুভূমি এবং পূর্ব-মধ্য মালভূমি, দক্ষিণ-পূর্বের সমুদ্র উপকূলে সর্বাধিক আখ চাষ হয়।

২. ভারত: আখ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়। দেশটির গাঙ্গেয় সমভূমি, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক প্রধান আখ উৎপাদনকারী অঞ্চল।

৩. চীন: চীন বিশ্বের তৃতীয় আখ উৎপাদনকারী দেশ। চীনের ইয়াং সিকিয়াং নদীর উপত্যকা ও বদ্বীপ অঞ্চলে সর্বাধিক আখ চাষ হয়।

৪. থাইল্যান্ড; থাইল্যান্ড বিশ্বের চতুর্থ আখ উৎপাদনকারী দেশ। থাইল্যান্ডের মধ্য-পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাংশ আখ উৎপাদনে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

৫. পাকিস্তান: পাকিস্তান বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম আখ উৎপাদনকারী দেশ। পাকিস্তানের সিন্ধু নদের অববাহিকা, লাহোর, লায়ালপুর, শিয়ালকোট, মুলতান, ভাওয়ালপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে আখের চাষ হয়।

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

৬. মেক্সিকো: আখ উৎপাদনে মেক্সিকোর অবস্থান বিশ্বে ষষ্ঠ। দেশটির লিয়ন, ভেরাক্রুজ, নুইতো, টামাউলিপাশ প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে আখের চাষ হয়।

৭. ইন্দোনেশিয়া: আখ উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়ার স্থান বিশ্বে সপ্তম। এদেশের জাভা দ্বীপের লাভা গঠিত মৃত্তিকায় আখ ভালো জন্মে।

৮. অস্ট্রেলিয়া: অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের অষ্টম আখ উৎপাদনকারী দেশ। দেশটির কুইন্সল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর আখ উৎপাদিত হয়।

৯.যুক্তরাষ্ট্র: আখ উৎপাদনে বিশ্বে দেশটির অবস্থান নবম। দেশটির ফ্লোরিডা, লুইজিয়ানা, টেক্সাস প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে আখের ফলন সর্বাধিক।

১০. গুয়েতেমালা: আখ উৎপাদনে বিশ্বে দেশটির অবস্থান দশম এবং ল্যাটিন আমেকিায় ২য়। দেশটির ত্রিনিদাদ, মেগডেলিনা, লা সনোরিসা, লা ইউনিয়ন সান্তায়ানো, মাদ্রি, সান্তা তেরেসা প্রভৃতি এলাকায় আখের ফলন ভালো হয়।

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

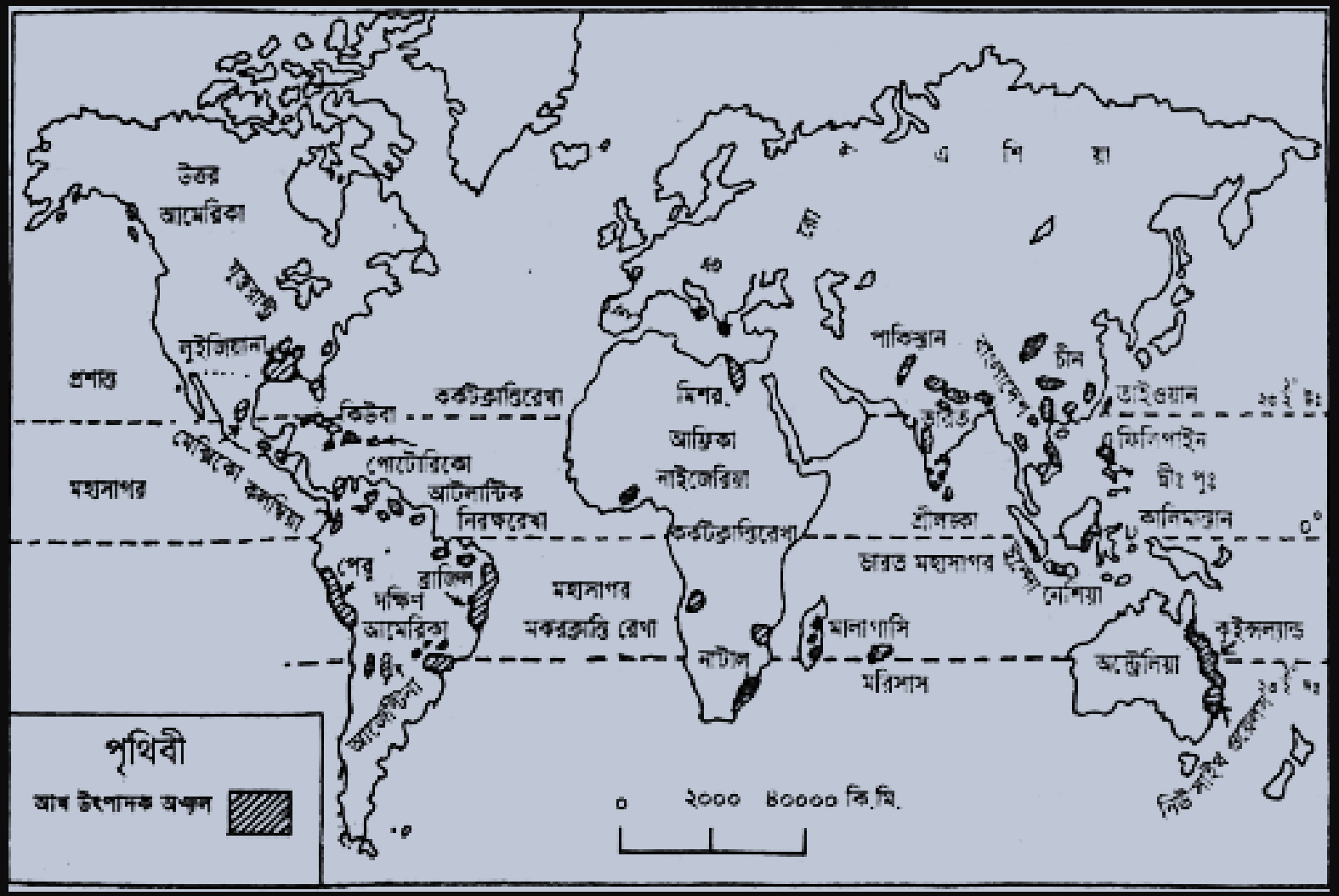

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

আখের বিশ্ববাণিজ্য (International Trade of Sugarcane)

সারাবিশ্বে চিনির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সেজন্য আখ চাষের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিশ্বের কয়েকটি দেশে যথেষ্ট পরিমাণ আখ উৎপাদিত হলেও বিশ্ববাণিজ্যে এর পরিমাণ খুব কম। এশিয়ার দেশগুলোতে (পাকিস্তান, চীন, থাইল্যান্ড) ধান চাষের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় আখ উৎপাদন কমে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে (কলম্বিয়া, ব্রাজিল, চিলি) আখ উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রায় ৩০.৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের চিনি বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে যা বিগত বছরের তুলনায় +২০.২ শতাংশ বেশি এবং ৩৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের চিনি আমদানি করে যা বিগত বছরের তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ বেশি। (সূত্র: WTE,-2025) 1

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

সারণি-৪.৭: আখের (চিনি) বিশ্ববাণিজ্য-২০২৪

(বিলিয়ন ডলার হিসেবে)

দেশ	রপ্তানি	দেশ	আমদানি
১. ব্রাজিল	১৮.৬	১. ইন্দোনেশিয়া	৩
২. থাইল্যান্ড	২.৪	২. চীন	২.৪
৩. ভারত	২.৩	৩. যুক্তরাষ্ট্র	২.৭
৪. ফ্রান্স	১.৬	৪. ভারত	১.৮
৫. জার্মানি	১.২	৫. মালয়েশিয়া	১.৩৬
সর্বমোট	৩০.৯	সর্বমোট	২৬.৪

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

উন্নয়নশীল বিশ্বে আখ চাষের সমস্যা ও সমাধান

(Problem and Solution of Sugarcane Cultivation in Developing Countries)

উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো আখ চাষে তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি। কারণ এসব দেশে আখ চাষ নানা সমস্যায় জর্জরিত। অধিকাংশ আখ উৎপাদনকারী দেশ কৃষিতে অনুন্নত। বিশ্বে আখ চাষের সমস্যা সমাধান করতে হলে ধারাবাহিক ও সমন্বিত কৃষি নীতির প্রয়োজন।

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

উন্নয়নশীল দেশের আখ চাষে কিছু সমস্যা বিরাজমান। সেগুলো হলো-

১. প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব,
২. কৃষি ঋণের স্বল্পতা,
৩. দক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতা,
৪. অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা,
৫. শক্তি সম্পদের অপ্রতুলতা,
৬. অনিশ্চিত বাজার,
৭. উন্নত সার ও কীটনাশকের অভাব,
৮. জলবায়ু পরিবর্তন,
৯. মৃত্তিকার গুণাগুণ,
১০. ক্ষুদ্র খামার ব্যবস্থা,
১১. কারিগরি জ্ঞান ও গবেষণার অভাব,
১২. সমন্বিত কৃষিনীতির অভাব প্রভৃতি

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

উন্নয়নশীল বিশ্বে আখ চাষের সমস্যার সমাধান

উন্নয়নশীল বিশ্বে আখ চাষে বিরাজমান সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

১. পর্যাপ্ত কৃষিঋণের ব্যবস্থা,
২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ,
৩. উন্নতমানের আখের চারা সরবরাহ,
৪. উন্নতমানের সার ও কীটনাশক সরবরাহ,
৫. সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন,
৬. বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন,
৭. উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা,
৮. ভর্তুকি প্রদান ও অনুকূল দাম নির্ধারণ,
৯. সুষ্ঠু শ্রমিক ব্যবস্থাপনা,

আখ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

১০. গুদামজাতকরণ সুবিধা,
১১. লোডশেডিংমুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ,
১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা,
১৩. গবেষণা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি।

আখ বর্তমান বিশ্বের অন্যতম অর্থকরী ফসল হওয়া সত্ত্বেও এর চাষাবাদে প্রতিবন্ধকতার অভাব নেই। এমতাবস্থায় উন্নয়নশীল বিশ্বে আখ চাষে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করলে আখের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ০৫ চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ (Factors of Tea Production)

চা পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয়। এটি মূলত ক্রান্তীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ। স্বাভাবিকভাবে চা গাছ ৯ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাতা ও কুঁড়ি সংগ্রহের সুবিধার্থে চা গাছ ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার উঁচু থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়। অতঃপর পাতা ও কুঁড়ি শুকিয়ে গুড়ো করে উষ্ণ পানি, সামান্য দুধ ও চিনির সাহায্যে পরিবেশন করা হয়। চা পানে শরীর ও মন সতেজ হয়। চা এর বৈজ্ঞানিক নাম Camellia sinensis ।

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

অনুকূল নিয়ামক: বাগান তৈরির ৫ বছর পর থেকে নিয়মিতভাবে চা পাতা সংগ্রহ করা যায়। এভাবে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ বছর পাতা সংগ্রহ করা হয়। চা চাষ অর্থাৎ চা বাগান তৈরির উপযোগী নিয়ামকসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো:

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ:

১. জলবায়ু: উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ ও অধিক আর্দ্র জলবায়ু চা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। চা গাছের বৃদ্ধিকালীন সময়ে তাপমাত্রা ২০০ সে. অপেক্ষা বেশি হওয়া আবশ্যক। চা গাছ স্বল্প তাপমাত্রা সহ্য করতে পারলেও তীব্র শীত চা গাছের ক্ষতি সাধন করে।

২. বৃষ্টিপাত: নিরক্ষীয় এবং আর্দ্র মৌসুমি জলবায়ু চা চাষের জন্য বেশি উপযোগী। যেসব এলাকায় বছরে ১২৫ থেকে ৬২৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত এবং শুষ্ক ঋতু ক্ষণস্থায়ী হয়, সেখানে চা গাছের পাতা ও কুঁড়ি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

৩. ভূপ্রকৃতি: সমুদ্রপৃষ্ঠের ৬০০ থেকে ১২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত পার্বত্য ঢালু অঞ্চলে চা বাগান গড়ে তোলা হয়। এরূপ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত শীতল। সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও চা গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকে না। চা বাগান তৈরির জন্য এ ধরনের পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা চা গাছের পাতার গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। যেমন- সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০০ মিটার এবং তার চেয়ে বেশি উচ্চতায় অবস্থিত বাগান থেকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের চা পাতা সংগ্রহ করা হয়।

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

৪. মৃত্তিকা: নাইট্রোজেনযুক্ত কিছুটা অম্লধর্মী মৃত্তিকা চা গাছ জন্মানোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। লৌহ মিশ্রিত এবং আগ্নেয় ভস্মযুক্ত মৃত্তিকাতেও চা গাছ জন্মাতে পারে।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহ:

১. সুলভ শ্রমের যোগান: বাগান তৈরি, চারা রোপণ, গাছের পরিচর্যা, নির্দিষ্ট সময় অন্তর পাতা ও কুঁড়ি সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভর করে। এসব কাজ যান্ত্রিক উপায়ে সম্পন্ন করা সহজ নয়। কাজেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা বাগান গড়ে তোলার জন্য সুলভ শ্রমের যোগান থাকা আবশ্যক।

২.মৃত্তিকা ক্ষয়রোধ ও ছায়া সৃষ্টি: প্রখর সূর্য কিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে চা গাছের পাতা ও কুঁড়ি রক্ষা এবং সজীব রাখার জন্য চা বাগানে ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই বৃক্ষগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যে, বাগানের মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ সম্ভব হয়।

৩. চারা তৈরি: চা বাগানের জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে চারা তৈরি করা হয়। এ জন্য উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক কলাকৌশল দক্ষতা সহকারে কাজে লাগানো হয়। বাগানের বিকাশ সময়মতো ভালো জাতের চা গাছের চারা প্রাপ্তির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

৪. সার ও কীটনাশকের যোগান: চা বাগানের মৃত্তিকায় নাইট্রেট এবং অন্যান্য উপাদানের ঘাটতি পূরণে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষার জন্য কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। এসবের যোগান চা বাগানের স্বাভাবিক বিকাশকে প্রভাবিত করে থাকে।

৫. প্রক্রিয়াজাতকরণ: চা বাগান থেকে যথাসময়ে পাতা ও কুঁড়ি সংগ্রহ করে তা প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এ কাজে প্রচুর দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়।

৬. পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা: চা বাগান থেকে পাতা সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে প্রেরণ করা হয়। উন্নত সড়ক ও রেল পরিবহন এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এই প্রেরণ কার্যক্রমকে অনেক সহজ করে।

৭. পুঁজি: বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা বাগান গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।

৮. রপ্তানি সুবিধা: আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ একটি অঞ্চলে চা বাগান সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

প্রধান প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশ (Major Tea Producing Countries)

১. চীন: ধারণা করা হয়, চীনে সর্বপ্রথম বুনো অবস্থা থেকে চা গাছকে চায়ের আওতায় আনা হয়। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চা উৎপাদনকারী দেশ চীন। এখানে প্রধানত পাঁচ ধরনের চা উৎপাদিত হয়। যথা: কালো, সবুজ, জেসমিন, ওলো এবং ইস্টক চা। প্রধানত রপ্তানির উদ্দেশ্যে দেশটিতে কালো চা উৎপাদন করা হয়। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে অবস্থিত সিচুয়ান, হুনান, আনহুই, ফুকিয়েন প্রদেশের বর্ষণমুখর পার্বত্য ঢালে অধিক চা বাগান গড়ে উঠেছে।

২. ভারত: বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় চা উৎপাদনকারী দেশ ভারত। বেশিরভাগ বাগান আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এ বিশ্বমানের চা উৎপাদিত হয়। এখানকার চা বাগানগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০০ মিটার বা তার চেয়ে বেশি উচ্চতায় অবস্থিত। মেঘালয় এবং দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু ও কেরালা রাজ্যে অবস্থিত বাগানগুলো থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চা পাতা সংগ্রহ করা হয়।

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

দেশ	উৎপাদন (হাজার মেট্রিক টন)	দেশ	উৎপাদন (হাজার মেট্রিক টন)
১. চীন	১৬০১৩	৬. ভিয়েতনাম	১১২৫
২. ভারত	৬৩৪৩	৭. ইন্দোনেশিয়া	৬৪৭
৩. কেনিয়া	২৫৭৮	৮. বাংলাদেশ	৪০৬
৪. শ্রীলংকা	১৪৩৪	৯. মায়ানমার	১১৮
৫. তুরস্ক	১৩৫৭	১০. থাইল্যান্ড	১০৬

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

৩. কেনিয়া: কেনিয়া বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদনকারী দেশ। দেশটির কেরিকু, বোমেট, নান্দি, কিয়াম্বো, মারাগুয়া, মেরু প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর চা উৎপন্ন হয়ে থাকে। দেশটির উৎপাদিত চা এর মধ্যে 'ব্ল্যাক টি' প্রধান এবং জনপ্রিয়। এছাড়া গ্রিন টি, ইয়েলো টি এবং হেয়াইট টিও দেশটিতে উৎপন্ন হয়।

৪. শ্রীলংকা: শ্রীলঙ্কার পার্বত্য ভূপ্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থান চা চাষে সহায়ক। এখানে পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পাহাড়ের ঢালে প্রায় সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয়। শ্রীলঙ্কার মধ্যভাগে অবস্থিত পর্বতকে ঘিরে চা বাগান গড়ে উঠেছে। নিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্রতার ঘাটতি না থাকায় বাগানের চা গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে সারা বছর ধরে সপ্তাহে অন্তত দুবার চা পাতা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

৫. তুরস্ক: চা উৎপাদনে তুরস্কের অবস্থান বিশ্বে পঞ্চম। দেশটির কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী জর্জিয়া সংলগ্ন এলাকায় অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এ অঞ্চলের পার্বত্য ঢালে এ দেশের চা বাগানগুলো অবস্থিত।

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

৬. ভিয়েতনাম: চা উৎপাদনে ভিয়েতনাম বিশ্বে ষষ্ঠ। এখানে কালো, সবুজ এবং জেসমিন চা উৎপন্ন হয়।

৭. ইন্দোনেশিয়া: ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম জাভার পার্বত্য ঢালে বহু চা বাগান গড়ে উঠেছে। সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরাংশে প্রচুর চা বাগান রয়েছে। এ দেশের চা বাগানগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠের ৪৫০ থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত।

৮. বাংলাদেশ: চা উৎপাদনে দেশটি বিশ্বে দ্বাদশ। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ২৭৯,৪৩৯ হেক্টর জমিতে ১০.৩ কোটি কেজি চা উৎপাদন করে। দেশের অধিকাংশ চা বাগানগুলো মৌলভীবাজার, সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া উঁচু ঢালসমূহে অবস্থিত। ২০২২ সালে এদেশে চা আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৫ ও ৬.৮ লাখ কেজি। যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশী চায়ের প্রধান ক্রেতা। দেশে মোট নিবন্ধনকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৬৮টি। মৌলভীবাজারে ৯০ টি, হবিগঞ্জে ২৫টি, সিলেটে ১৯টি, চট্টগ্রামে ২২টি, পঞ্চগড়ে ৮টি, রাঙামাটিতে ১টি, ঠাকুরগাঁয়ে ২টি চা বাগান রয়েছে। (সূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড)

চা উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ

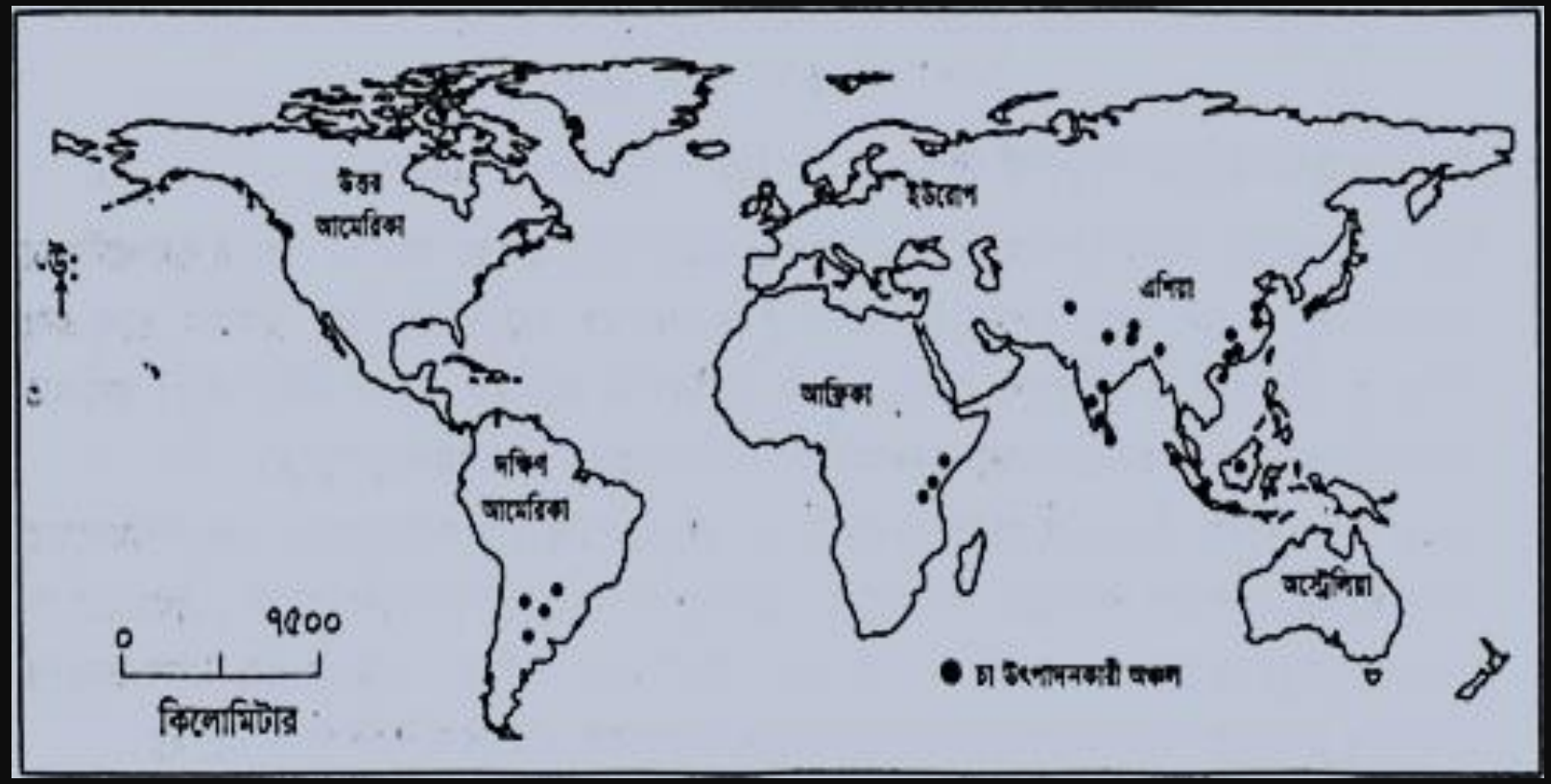

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ০৬ কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

ভূমিকর্ষণ তথা চাষ ও বীজ বপনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনকে কৃষিকাজ বলে। তবে যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষির সংজ্ঞায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে কৃষিকাজ শুধু ফসল উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং হাঁস-মুরগি পালন মৎস্য চাষ, পশুপালন, শস্য উৎপাদন সবকিছুতেই বিস্তৃত হয়েছে। কৃষির ক্ষেত্রসমূহকে আমরা তাই চার ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

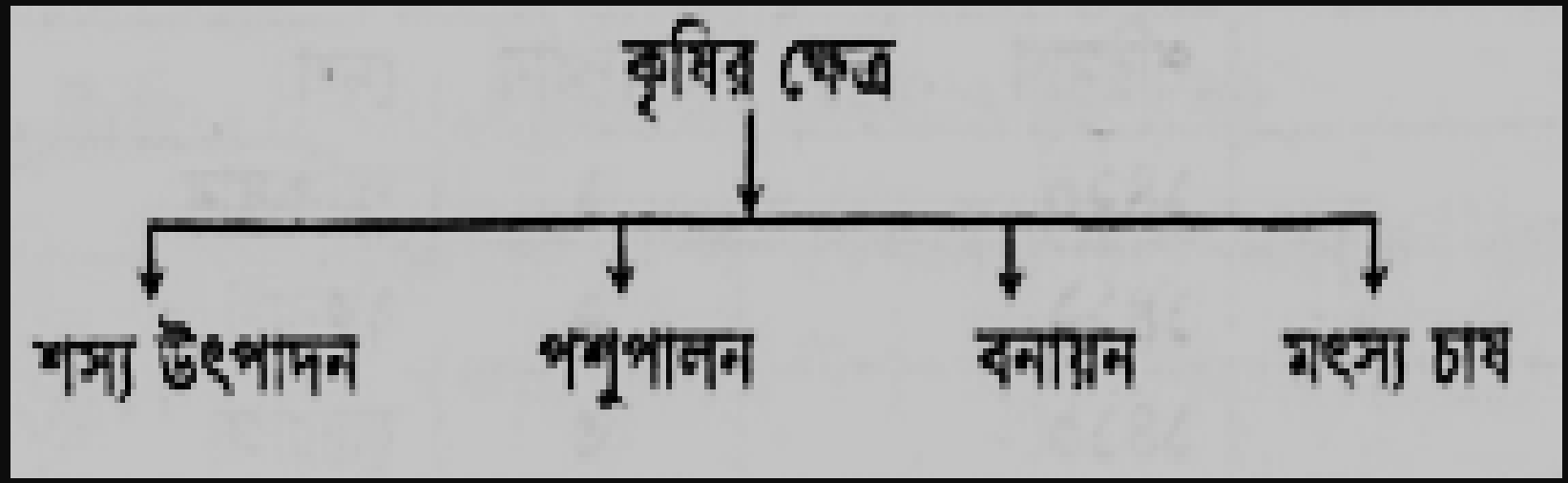

কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

ফসল উৎপাদন (Crop Production)

শস্য তথা ফসল উৎপাদন কৃষির প্রধানতম এবং প্রাচীনতম ক্ষেত্র। বিভিন্ন প্রকার শস্য নিয়ে কৃষির এই ক্ষেত্র গঠিত। মূলত খাদ্যশস্য এবং অর্থকরী এই দুই ধরনের ফসল নিয়ে শস্য উৎপাদন ক্ষেত্র গঠিত। বর্তমান বিশ্বে মোট আবাদি জমির অধিকাংশ ব্যবহৃত হয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে। অবশিষ্ট জমি অর্থকরী ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যসমূহের মধ্যে ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অর্থকরী ফসলসমূহের মধ্যে ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু, আলু, তামাক, পাট, রেশম, রাবার, চা প্রভৃতি প্রধান। বিশ্বের মোট কৃষিখাতের প্রায় ৬০ শতাংশ লোক শস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। গোটা বিশ্বের মানুষের বেঁচে থাকা এবং কৃষি বিষয়ক বাণিজ্যের প্রধানতম খাত হচ্ছে শস্য উৎপাদন খাত।

কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

পশুপালন (Herding)

পশুপালন বলতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, উট, ঘোড়া, হাঁস, মুরগি, কুকুর, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, কুমির, সাপ প্রভৃতি পালনকে বুঝানো হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে যাযাবর অবস্থায় মানুষ জীবিকার উদ্দেশ্যে পশুপালন করলেও বর্তমানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পশুপালন হয়ে থাকে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে বিশাল আকারে পশুপালন কেন্দ্র দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা। খামারে উৎপাদিত দুধ, মাংস, পশম, হাড়, চামড়া এবং ঐ সমস্ত প্রাণীর ছোট বাচ্চা, ডিম প্রভৃতি দেশের অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহে সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশুপালন সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হয়েছে। যেমন- ভারত, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা।

কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

বনায়ন (Afforestation)

বন হতে প্রাপ্ত জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, মোম, মধু, রাবার, প্রভৃতি' নিয়ে এই কৃষিখাত গঠিত। সমগ্র বিশ্বজুড়ে কমবেশি এই খাত প্রচলিত আছে। পরিবেশ রক্ষায় বনায়ন খাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

মৎস্য চাষ (Fish Cultivation)

সমগ্র বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষিখাত হচ্ছে মৎস্য সম্পদ খাত। আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এই খাত খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মৎস্য সম্পদ দুই ধরনের হয়ে থাকে; যথা- মিঠা পানির ও সামুদ্রিক। পৃথিবীর অনেক উন্নত রাষ্ট্র; যেমন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল, ব্রিটেন আর্জেন্টিনা, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে সরাসরি জড়িত। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সামুদ্রিক মাছ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উন্নত রাষ্ট্রসহ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ মিঠা পানির মাছ চাষের সাথে জড়িত। মিঠা পানির মাছ প্রধানত অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয়।

কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

কৃষির প্রকারভেদ (Classification of Agriculture)

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী যেমন কৃষির সৃষ্টি হয়, তেমনি কৃষিক্ষেত্রও অনেক ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এ কৃষিপদ্ধতিগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিতি। নিচে তার মধ্যে প্রধান কিছু ধরন আলোচনা করা হলো-

১. প্রগাঢ় বা নিবিড় কৃষি (Intensive Farming): যে কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে জমিতে ক্রমাগত প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ করে, সার দিয়ে এবং মূলধন খাটিয়ে ভূমির যতটুকু উৎপাদন করার ক্ষমতা আছে তার সবটুকু উৎপাদন করা হয় তাকে প্রগাঢ় কৃষি বলে। এ কৃষিব্যবস্থায় জমি কখনো ফেলে রাখা হয় না। যেসব দেশে লোকসংখ্যার তুলনরায় জমির পরিমাণ কম সেখানে এ ধরনের কৃষিক্ষেত্রের প্রচলন আছে। যেমন- বাংলাদেশে অনেক ভূমির মালিক (ধনী কৃষক) লোক খাটিয়ে নিজেদের জমিতে ফসল উৎপাদন করে। দেশসমূহ: চীন, জাপান, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি দেশ।

কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

২. ব্যাপক কৃষি (Extensive Farming): যে কৃষি ব্যবস্থায় বিস্তৃত এলাকা জুড়ে আধুনিক কৃষি যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাপকভাবে কৃষিকাজ করা হয় তাকে ব্যাপক কৃষি বলে। যেসব অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম অথচ বিস্তৃত কৃষিযোগ্য জমি রয়েছে সেখানে ক্রমশ বেশি জমি পরিষ্কার করে ট্রাক্টর, রিপার, হারভেস্টর, থ্রেসার, পাওয়ার টিলার প্রভৃতি আধুনিক কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করে ব্যপক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করা হয়। এ রীতির চাষে কম শ্রমিক ও কম মূলধন নিয়োগ করে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশে অনেক সামর্থ্যবান কৃষক আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কৃষিকাজ করে। দেশসমূহ: কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়া।

৩. বাগিচা কৃষি (Plantation Farming): কোনো একটি এলাকায় শস্য রোপণ করে সেখানে থেকে একটানা ১৫-২০ বছর পর্যন্ত শস্য আহরণ করাকে বাগিচা কৃষি বলে। এক্ষেত্রে বড় বড় বাগিচা তৈরি করে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে কৃষিকাজ করা হয়।

কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

৪. মিশ্র কৃষি (Mixed Farming): যে কৃষিব্যবস্থায় একই ভূমিতে বাণিজ্যিক পশুপালন ও শস্যচাষ উভয় একই সাথে হয়ে থাকে তাকে মিশ্র কৃষি বলে। একই কৃষি খামার থেকে ধান, পাট, মেসতা, তিল, সরিষা, মরিচ, তরিতরকারি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন করা হয় এবং অবসর সময়ে পশুপালন ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করা হয় বলে এরূপ কৃষি পদ্ধতিকে 'বহুমুখী কৃষি' নামেও অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে এখন এরূপ অনেক ফার্ম গড়ে উঠেছে।

দেশসমূহ: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ।

৫. স্থানান্তরিত কৃষি (Shifting Cultivation); যে কৃষি পদ্ধতিতে আবাদি জমি পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষকদের বসতিও স্থানান্তর হয় তাকে স্থানান্তরিত কৃষি বলে। এ পদ্ধতিতে অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চল পরিষ্কার করে চাষাবাদের যোগ্য করে আবাদ করা হয়। এ কৃষিব্যবস্থায় দুই-তিন বছর অন্তর জমি বদল করা হয়।

দেশসমূহ: নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় এশিয়ার বনাঞ্চল, মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার অরণ্য এলাকা এবং বাংলাদেশের ও মায়ানমারের পাহাড়ি অঞ্চলেও এই চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

কৃষির ক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

৬. সবজি চাষ বা ট্রাক ফার্মিং (Truck Farming): বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষকে ট্রাক ফার্মিং বলে। একে Market Gardening-ও বলা হয়। সবজি দ্রুত পচনশীল দ্রব্য হওয়ায় সাধারণত কোনো শহরের নিকটেই এই ধরনের চাষাবাদ হয়ে থাকে, যাতে উৎপাদিত পণ্যের দ্রুত বিক্রয় নিশ্চিত করা যায়। আমাদের দেশে দেখা যায়, গাজীপুরে বাণিজ্যিকভাবে সবজি চাষ করা হয়; যাতে দ্রুত তা ঢাকার বাজারে প্রবেশ করে এবং বিক্রি হয়ে যায়।

দেশসমূহ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় উৎপাদিত সবজি নিউইয়র্কে বাজারজাত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে এই ধরনের চাষাবাদ দেখা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ০৭ বাংলাদেশের প্রধান কৃষিক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটে কৃষির ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করা হলো-

শস্য উৎপাদনক্ষেত্র (Crop Production Sector)

বিভিন্ন প্রকার শস্য নিয়ে বাংলাদেশে কৃষির এই ক্ষেত্র গঠিত। এটি বাংলাদেশে কৃষির বৃহত্তম ক্ষেত্র। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন শস্য উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শস্য হচ্ছে ধান, পাট, ডাল, তৈলবীজ, আলু, তামাক, শাকসব্জি, রেশম, চা প্রভৃতি। আমাদের মোট কৃষি উৎপাদনের প্রায় ৫৭% এর বেশি উৎপাদিত হয় শস্য উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে। ধান এবং পাট যথাক্রমে বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল। পাট এদেশে "সোনালী আঁশ" নামে পরিচিত।

খাদ্যশস্য	পরিমাণ (লক্ষ মেট্রিক টন)
আউশ	২৯.০১
আমন	১৫৪.৩৩
বোরো	২০৭.৬৭
মোট চাল	৩৯১.০২
গম	১১.৭১
ভূট্টা	৬৪.৩২
সর্বমোট	৪৬৭,০৪

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

মৎস্য উৎপাদন (Fish Production)

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষিখাত হচ্ছে মৎস্য খাত। এদেশে আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি আয়ের প্রায় ২১.৮৩ শতাংশ এই খাত থেকে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মৎস্য খাত আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- i) মিঠা পানির মৎস্য ও ii) সামুদ্রিক মৎস্য। দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন মৎস্য খামার ও হ্যাচারী বৃদ্ধি পাওয়ায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া দেশের উপকূলভাগে প্রায় সারাবছর জেলেরা বিভিন্ন সামুদ্রিক মৎস্য জীবিকা নির্বাহ করছে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হলো মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে এদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪৯.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে। মুক্ত জলাশয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৩য় ও ৫ম স্থানে রয়েছে (২০২৩)।

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

খাত	পরিমাণ (লক্ষ মেট্রিক টন)
১. অভ্যন্তরীণ	
ক. মুক্ত জলাশয়	১৩.৮৪
খ. চাষকৃত	২৮.৫২
২. সামুদ্রিক	৬.৭৯
সর্বমোট	৪৯.১৫

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

প্রাণিসম্পদ (Animal Resources)

কৃষির উপযোগ সৃষ্টি, গ্রামীণ পরিবহন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশু সম্পদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, ভেড়া, বিভিন্ন প্রকার পাখি প্রভৃতি আমাদের দেশে পশু সম্পদ হিসেবে পালন করা হয়। এ সমস্ত পশুপাখির মাংস, চামড়া, দুধ, ডিম, পশম, বাচ্চা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। বাংলাদেশের মোট কৃষি আয়ের ১৬.৫২% প্রাণিসম্পদ খাত থেকে আসে। আমাদের দেশে যদি বাণিজ্যিকভাবে আরো ব্যাপক পরিসরে পশুপাখির খামার করা হতো, তাহলে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারতাম।

প্রাণিসম্পদ	সংখ্যা (লক্ষ)
গরু	২৪৬
মহিষ	১৫
ছাগল	২৬৬
ভেড়া	৩৭
মোরগ-মুরগি	৩০৪১
হাঁস	৬১৮

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

বনজ সম্পদ (Forest Resources)

বনায়ন বা সামাজিক বনায়ন কৃষিখাতের একটি নতুন ধারণা। কাঠ, বাঁশ, বেত, মোম, মধু, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি নিয়ে কৃষির এই ক্ষেত্রটি গঠিত। এই খাত থেকে মোট কৃষি আয়ের ৮% পাওয়া যায়। আমাদের (সব ধরনের বনভূমি মিলে) দেশের মোট আয়তনের ১৭.৫১% বনভূমি রয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় বনভূমির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ যদি আরও বেশি থাকতো এবং আমরা যদি নির্বিচারে বন ধ্বংস না করতাম, তাহলে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক লাভবান হতে পারতাম।

কৃষিখাত	মোট পরিমাণ (কোটি টাকা)
১. শস্য উৎপাদন	২৩৯৫১৫
২. মৎস্য সম্পদ	১০৯৬৪৫
৩. প্রাণিসম্পদ	৭৩৬৬৫
৪. বনজ সম্পদ	৭১৩৩৪

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিক্ষেত্র: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্য চাষ

উপরের আলোচনা এবং সারণী হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশে কৃষির বিভিন্ন খাতের মধ্যে শস্য উৎপাদন খাতই প্রধান। এই খাতের মধ্যে আবার অর্থকরী ফসলের তুলনায় খাদ্যশস্যকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে আছে মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বনায়ন খাত। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ সমস্ত খাত থেকে আমরা অধিক উপযোগ পেতে পারি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ০৮ বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান

বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক (শতকরা ৮০ ভাগ; সূত্র- BARC) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি পেশায় নিয়োজিত। এদেশের অর্থনীতির প্রধান উৎস কৃষি। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ পরাধীন থাকায় এবং নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার কারণে এদেশে কৃষিকাজ নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি। স্বাধীনতার পূর্বে এদেশের কৃষি ছিল সনাতন পদ্ধতির। জমি অত্যন্ত উর্বর হলেও প্রকৃতি নির্ভরতা ও প্রাচীন পদ্ধতির চাষাবাদের কারণে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হতো না। তবে আশার কথা এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এদেশের সরকার কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়ে কৃষিবিষয়ক উচ্চতর গবেষণার জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। ফলে বাংলাদেশের কৃষি আজ বিশ্ব পর্যায়ে স্থান করে নিয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কৃষিসংস্থাসমূহের বর্ণনা

১. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (Soil Resources Development Institute-SRDI): কৃষিকাজে মাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বাংলাদেশের মাটি খুবই উর্বর। তবে কোন মাটিতে কী ধরনের ফসল জন্মে এবং কোন এলাকার মাটিতে কী ধরনের সমস্যা আছে এসমস্ত বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৃত্তিকা জরিপ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এই সংস্থাই কাজের ব্যাপকতার কথা চিন্তা করে ১৯৮৩ সালে 'মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' নামে নতুন কর্ম পরিধি নিয়ে কাজ শুরু করে। সংস্থাটি ঢাকার ফার্মগেটে অবস্থিত।

কৃষিতে অবদান: মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট মূলত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে কাজ করে থাকে। কোন মাটি কোন ধরনের ফসলের জন্য উত্তম সেই সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান সংস্থাটির অন্যতম উদ্দেশ্য। কোনো জমিতে আশানরূপ ফসল উৎপাদিত না হলে সেই জমির মাটি নিয়ে গবেষণা করে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করে সংস্থাটি। এছাড়া এই সংস্থায় মাটি পরীক্ষার জন্য ৬টি ভ্রাম্যমাণ গাড়ি আছে। দেশের যেকোনো প্রান্তে গিয়ে মাটি পরীক্ষা করে যথার্থ পরামর্শ প্রদান এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান

২. বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (Bangladesh Agricultural Research Council-BARC): বাংলাদেশের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার জন্য ১৯৭৩ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি গবষেণা কাউন্সিল গঠিত হয়। ঢাকার ফার্মগেটে অবস্থিত সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে দেশের খ্যাতনামা কৃষি বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেন।

কৃষিতে অবদান: বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক গবেষণা, পরামর্শ প্রদান, গবেষণা তত্ত্বাবধান করা এবং বিভিন্ন কৃষি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সংস্থাটির উদ্দেশ্য।

৩.বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Agricultural Research Institute-BARI):১৯০৮ সালে লর্ড কার্জন নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন। এ কৃষি সংস্থাটি নানা ধাপ পেরিয়ে ১৯৭৬ সালে BARI নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্থাটির ৭টি গবেষণা কেন্দ্র এবং ২৮টি আঞ্চলিক উপকেন্দ্র রয়েছে। এর সদরদপ্তর গাজীপুরের জয়দেবপুরে অবস্থিত।

কৃষিতে অবদান: বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি বৃহৎ সংস্থা। সব ধরনের কৃষি ফসল ও বীজ সম্পর্কে গবেষণা করে নতুন জাত উদ্ভাবন, রোগ নির্ণয়, কীটপতঙ্গ দমন কৌশল, কীটনাশক প্রয়োগ, নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করা এই সংস্থার প্রধান কাজ। সংস্থাটি এ পর্যন্ত ফসলের ২৯০টি জাত ও ৩১০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান

৪. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Rice Research Institure-BRRI): ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে নতুন করে যাত্রা শুরু করে। ঢাকার অদূরে গাজীপুরে প্রায় ৭৭ হেক্টর জায়গা জুড়ে BRRI এর কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া সারা দেশে সংস্থাটির ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয় আছে।

কৃষিতে অবদান: ধান বাংলাদেশের প্রধান কৃষি ফসল। এই ধান সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা যেমন- ধানের উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন, রোগ নির্ণয়, কোন ধরনের মাটিতে কী ধরনের ধান জন্মে তা বের করা তথা ধান সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণা করা এই সংস্থার প্রধান কাজ।

৫. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (Bangladesh Agricultural Development Corporation, BADC): East Pakistan Agricultural Development Corporation নামে ১৯৬১ সালে সংস্থাটির যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৬ সালে কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নকল্পে সংস্থাটি নতুনভাবে BADC নামে যাত্রা শুরু করে। ঢাকায় অবস্থিত সংস্থাটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন।

কৃষিতে অবদান: সমগ্র দেশের কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নকল্পে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। কাজের সুবিধার্থে দেশের সকল উপজেলা পর্যায়ে এই সংস্থার কার্যালয় আছে। এই সংস্থাটি মূলত বিভিন্ন ফসলের বীজ সংরক্ষণ ও সময়মতো সরবরাহ, সেচ প্রদান, ফসল সংরক্ষণ ও সরবরাহ, সার সরবরাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান

৮. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (Agricultural University): বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কৃষিতে বা কৃষি বিষয়ক কাজে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলো হলো-

ক. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; খ. শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; গ. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট; ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর; ৫. খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও (খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি) কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা ও পড়াশুনার সুযোগ আছে।

কৃষিতে অবদান: কৃষি বিষয়ক জ্ঞান আহরণ, উচ্চতর গবেষণার সুযোগ এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে।

৯. ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় (Veterinary University): পশু চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় বিষয়ক পড়াশুনা ও উচ্চতর গবেষণার জন্য চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ সংক্রান্ত পড়াশুনার সুযোগ আছে।

কৃষিতে অবদান: বিভিন্ন প্রাণীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাসেবা প্রদান সংক্রান্ত উচ্চতর পড়াশুনা ও গবেষণার সুযোগ প্রদান করা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান

১০. কৃষি তথ্য সেবা (Agricultural Information Service-AIS): সব ধরনের কৃষি সেবা সংক্রান্ত তথ্য পেতে ১৯৬৯ সালে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর লক্ষ হলো কৃষি ও কৃষক সংশ্লিষ্টদের কৃষিবিষয়ক জ্ঞান সমৃদ্ধকরণ।

কৃষিতে অবদান: কোথাও কোনো নতুন ফসলের জাত উদ্ভাবন হয়েছে কিনা, কোন এলাকায় ফসলের উৎপাদন ব্যবস্থা কেমন, কোন রোগের কী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, নতুন চাষাবাদ পদ্ধতি প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্য এই সংস্থার মাধ্যমে জানা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ০৯ বাংলাদেশের কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি

বাংলাদেশের কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি

কৃষি বাংলাদেশের মানুষের প্রধান উপজীবিকা হলেও এদেশের কৃষি এখনো প্রকৃতি নির্ভর। প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, সেচের জন্য বৃষ্টির ওপর অতি নির্ভরতা, ফসল আহরণ ও মাড়াই এ শ্রমিক নির্ভরতা, সনাতন সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে একর প্রতি ফসল উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কম। এর ফলে আমরা প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারিনি। কিন্তু অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় নতুন নতুন ফসলের জাত উদ্ভাবন, আধুনিক পদ্ধতিতে সেচ ও চাষাবাদ, স্বয়ংক্রিয় ফসল মাড়াইকরণ যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করতে পারলে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হতো। এর ফলে কৃষকদের, পাশাপাশি দেশবাসী আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারতো। তবে আশার কথা এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমাদের কৃষিক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। ব্যাপকভাবে না হলেও সীমিত পরিসরে আমাদের কৃষকেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার:

বাংলাদেশের কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি

ক. জমি চাষে প্রযুক্তি: পূর্বে আমাদের দেশে গরু ও লাঙলের সাহায্যে জমি চাষাবাদ করা হতো। এতে সময় যেমন বেশি লাগত, তেমনি ভালোভাবে চাষ করা যেত না। কিন্তু বর্তমানে উন্নতমানের 'ট্রাক্টর' বা কলের লাঙলের সাহায্যে একদিনে অনেক জমি কর্ষণ করা যায়। ছোট ছোট খণ্ডের জমিতে বা বর্ষাকালে কাদা পানিতে কর্ষণ করার জন্য ছোট আকারের 'পাওয়ার টিলার' মেশিন বিশেষ উপযোগী। এই সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার কৃষিকাজকে অনেক সহজ ও সমৃদ্ধ করেছে।

খ. সেচের কাজে প্রযুক্তি: কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দেশে জমিতে পানিসেচের একমাত্র উৎস ছিল বৃষ্টির পানি। সেচ কৃষিকাজে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেসময় কোনো বছরে যদি কম বা দেরিতে বৃষ্টিপাত হতো, তাহলে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতো। কিন্তু বর্তমানে কৃষকগণ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক বিভিন্ন সেচযন্ত্র ব্যবহার করে জমিতে সময়মতো পানি দিয়ে থাকেন। ডিজেল এবং বিদ্যুৎ চালিত এ সমস্ত সেচযন্ত্র মাটির গভীর থেকে পানি উত্তোলন করে কৃষি জমিতে সরবরাহ করে থাকে। ফলে বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত পানির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারায় প্রচুর ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি

গ. বীজ বপনে প্রযুক্তি: বীজ বপনের জন্য বর্তমানে 'ড্রামসিডার' নামক আধুনিক যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। এই যন্ত্রের আবিষ্কারক বাংলাদেশ। ড্রামসিডারের সাহায্যে অল্প পরিশ্রমে বিস্তীর্ণ জমিতে অত্যন্ত দ্রুত সারিবদ্ধ ও সুনিপুণভাবে বীজ বপন করা যায়। বর্তমানে ধানের চারা রোপনের ক্ষেত্রে 'রাইস ট্রান্সপ্লান্টার' ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে এক একর জমিতে চারা রোপন করতে সময় লাগে দুই ঘণ্টা। কৃষিতে এসব যন্ত্রের ব্যবহার আমাদের মূল্যবান সময়, শ্রম এবং অর্থের অপচয় রোধ করে।

ঘ. সার প্রয়োগে প্রযুক্তি: ফসলের পুষ্টি এবং দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। শ্রমিকের দ্বারা হাতে হাতে সার প্রয়োগ করা সময়সাপেক্ষ এবং এর দ্বারা জমির সর্বত্র সার সুষমভাবে পড়ে না। এই অসুবিধা দূর করতে আমাদের দেশে সীমিত পরিসরে সার প্রয়োগের মেশিন ব্যবহার শুরু হয়েছে। এই মেশিনের দ্বারা দ্রুত এবং জমির সর্বত্র সুষমভাবে সার ছিটানো সম্ভব।

বাংলাদেশের কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি

ঙ. কীটনাশক প্রয়োগে প্রযুক্তি: সময়মতো কীটপতঙ্গ দমন করতে না পারলে ফসলের একটা বড় অংশ বিনষ্ট হয়। হাত দিয়ে কীটনাশক ব্যবহার করা সময় সাপেক্ষ এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বর্তমানে আমাদের দেশে ছোট ছোট দেশীয় মেশিনের সাহায্যে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়।

চ. ফসল সংগ্রহে প্রযুক্তি: সময়মতো জমি থেকে ফসল সংগ্রহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকের মাধ্যমে ফসল কাটা বা সংগ্রহ করা ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। এজন্য বর্তমানে আমাদের দেশের কোনো কোনো স্থানে জমি থেকে ফসল সংগ্রহে 'হারভেস্টার মেশিন' এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এই মেশিনের সাহায্যে অল্প সময়ে কয়েক একর জমির ফসল সংগ্রহ করা যায়। তবে সমস্যা হচ্ছে এই মেশিনের মাধ্যমে কেবল ধান, গম প্রভৃতি দানাদার জাতীয় ফসল সংগ্রহ করা যায়। পাট বা এ ধরনের তন্তু জাতীয় ফসল সংগ্রহ করতে এবং ক্ষুদ্রাকারের জমিতে এই যন্ত্র ব্যবহার করা যায় না।

ছ. ফসল মাড়াইয়ে প্রযুক্তি: জমি থেকে ধান বা অন্যান্য ফসল বাড়িতে আনার পর মাড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের শ্যালো মেশিন এবং হস্তচালিত মাড়াইকরণ মেশিন ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে 'কম্বাইন্ড হারভেস্টার' এর মাধ্যমে কৃষিখামারেই ধান কাটা থেকে শুরু করে ধান মাড়াই, ঝাড়া হয়ে একদম বস্তাবন্দী হয়ে বিক্রির জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এতে সময় লাগে একর প্রতি মাত্র দেয় ঘণ্টা। স্থানীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এ সমস্ত মেশিন দামে সস্তা হওয়ায় অনেক কৃষক এটি ব্যবহার করেন।

বাংলাদেশের কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি

জ. ফসল সংরক্ষণে প্রযুক্তি: পূর্বে যদি কোনো বছর কোনো একটি ফসলের ব্যাপক ফলন হতো তবে যথাযথ সংরক্ষণাগারের অভাবে ঐ ফসল সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। ফলে কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রায় প্রতি জেলায় আলু ও অন্যান্য পচনশীল পণ্য সংরক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক 'হিমাগার' নির্মাণ করা হয়েছে। এই সমস্ত সংরক্ষণাগারে কৃষকগণ উদ্বৃত্ত ফসল নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে সংরক্ষণ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে যেকোনো সময়ে বাজারজাত করতে পারেন। সংরক্ষণ সুবিধার ফলে একদিকে যেমন ফসলের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে, অপরদিকে কৃষি পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্যহ্রাস পেয়েছে।

ঝ. পরিবহনে প্রযুক্তি: একসময় ছিল যখন বাংলাদেশে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা ভালো ছিল না। ফলে দেশের এক প্রান্তে উৎপাদিত পণ্য অন্য প্রান্তে সময়মতো পৌছানো সম্ভব হতো না। যেমন- উত্তরবঙ্গে উৎপাদিত কাঁচা শাকসবজি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পৌছাতে অনেক সময় লাগতো। এর ফলে একদিকে পচনশীল পণ্যদ্রব্য পচে নষ্ট হতো; অন্যদিকে, সময়মতো পণ্যের সরবরাহ না থাকায় সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হতো না। কিন্তু বর্তমানে দেশের সর্বত্র রাস্তাঘাট উন্নত হওয়ায় এবং আধুনিক ও দ্রুতগতির যানবাহন থাকায় দেশের এক প্রান্তে উৎপাদিত পণ্য খুব অল্প সময়ে অন্য প্রান্তে পৌছানো সম্ভব হয়। এর ফলে দেশের সর্বত্র পণ্যের সুষম সরবরাহ সম্ভব হয় এবং কৃষক ভালো মূল্য পায়।

বাংলাদেশের কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি

ঞ. গণমাধ্যম প্রযুক্তি: আজকাল দেশের সর্বত্র রেডিও, ডিশ সংযোগসহ টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, সংবাদপত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। ফলে দেশ-বিদেশের যেকোনো খবর দেশের যেকোনো প্রান্তের মানুষের কাছে মুহূর্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এর ফলে দেশে নতুন জাতের কোনো ফসলের আবিষ্কার হলো কি না, উদ্ভিদ ও ফসলের রোগ, সেগুলোর প্রতিষেধক, নতুন চাষাবাদ পদ্ধতি, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা, কোথায় পণ্যের কী দাম প্রভৃতি সম্পর্কে কৃষক জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারে। কৃষকদের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে এই সমস্ত গণমাধ্যমগুলোতে পৃথকভাবে কৃষিবিষয়ক খবর প্রকাশ করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ১০ ঋতুভিত্তিক ফসল ও বাংলাদেশের জলবায়ু

ঋতুভিত্তিক ফসল ও বাংলাদেশের জলবায়ু

This Topic is important for

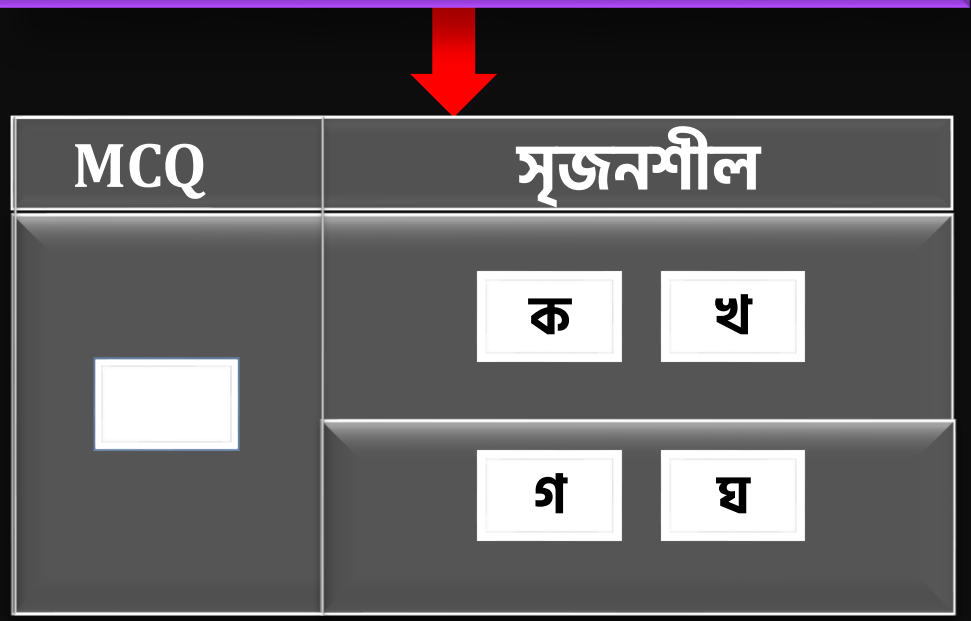

ঋতুভিত্তিক ফসল ও বাংলাদেশের জলবায়ু

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তবে এদেশের কৃষি এখনো বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিকশিত হয়নি। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বাংলাদেশের কৃষিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এতে করে ফলন বাড়লেও এগুলোর অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারে পরিবেশ ও খাদ্য দূষণ বেড়েছে। অবশ্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে (পাহাড়ি ও চর এলাকায়) এখনও সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ চালু আছে।

বৃষ্টিপাতের পানি এদেশের কৃষির প্রধানতম অবলম্বন। সময়মতো বৃষ্টিপাত না হলে, অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষি ফসলসমূহ এদেশের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত হয়।

ঋতুভিত্তিক ফসল ও বাংলাদেশের জলবায়ু

বাংলাদেশের জলবায়ু ও ঋতু (Climate and Season of Bangladesh)

বাংলাদেশকে বলা হয় ষড়ঋতুর দেশ। তবে জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে বর্তমানে ছয়টি ঋতু খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। প্রকৃত অর্থে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এদেশে সুস্পষ্টভাবে তিনটি ঋতু পরিলক্ষিত হয়। যথা:

ক. গ্রীষ্মকাল (মার্চ মে); খ. বর্ষাকাল (জুন অক্টোবর) এবং গ. শীতকাল (নভেম্বর ফেব্রুয়ারি)।

ঋতুভিত্তিক ফসল ও বাংলাদেশের জলবায়ু

ঋতুভিত্তিক উৎপাদিত প্রধান ফসল (Major Seasonal Crops)

ক. গ্রীষ্মকাল: বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল হিসেবে পরিচিত। এ সময় নিচের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়-i. তাপমাত্রা খুব বেশি থাকে, ii. সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৪০ ও ২১° সে., iii. গড় তাপমাত্রা ২৮০ সে., iv. এপ্রিল উষ্ণতম মাস, v. গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫১ সে.মি., vi. পানির অভাবে মাঠ ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে যায়, vii. মাঝে মাঝে কালবৈশাখী ঝড় হয়, viii. মোট বৃষ্টিপাতের ২০% গ্রীষ্মকালে হয়ে থাকে।

উৎপাদিত কৃষি ফসল: বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে উৎপাদিত প্রধান কৃষি ফসল হচ্ছে- ধান, পাট, আখ, সবজি প্রভৃতি।

গ. শীতকাল: বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়কালকে শীতকাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তবে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাস ব্যতীত শীতের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। এ সময় আর যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

i. বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে (১০ সেন্টিমিটারের কম), ii. উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়, iii. গড় তাপমাত্রা থাকে ১৭.৭° সে., iv. বায়ুপ্রবাহ শুষ্ক ও আর্দ্রতাহীন থাকে।

উৎপাদিত কৃষি ফসল: শীতকালে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ডাল, তেলবীজ, আলু, পিঁয়াজ, ধনিয়া, রসুন, তুলা প্রভৃতি প্রধান।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ১১ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. 'Agriculture' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. ল্যাটিন খ. গ্রিক গ. জার্মান ঘ. ফরাসি

২. কৃষিকাজের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
ক. Agriculture খ. Agros গ. Culture ঘ. Cultivate

৩. কৃষিকার্য কীসের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল?
ক. জলবায়ু খ. মৃত্তিকা গ. নদ-নদী ঘ. ভূমিরূপ

৪. ধানের ফলন সবচেয়ে ভালো হয় কোন ধরনের মৃত্তিকায়?
ক. উর্বর পলিমাটি খ. দোঁআশ মাটি গ. এঁটেল মাটি ঘ. বেলে মাটি

৫. ধান কোন অঞ্চলের ফসল?
ক. মৌসুমি খ. ক্রান্তীয় গ. ভূমধ্যসাগরীয় ঘ. নিরক্ষীয়

৬. চীনের কোন প্রদেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়?
ক. হোয়াংহো খ. ইয়াং সিকিয়াং গ. সেচুয়ান ঘ. হুনান

৭. চীনের কোন প্রদেশকে 'ধানের আধার' (Rice bowl) বলা হয়?
ক. হোয়াংহো খ. ইয়াং সিকিয়াং গ. সেচুয়ান অববাহিকা ঘ. হুনান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৮. ধানের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

ক. Oryza sativa
খ. Triticum aestivum
গ. Saceharum officinarum
ঘ. Camellia Sinensis

৯. গম কোন গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ?

ক. গ্রামিনি
খ. ক্যামেলিয়া
গ. ওরাইজা
ঘ. সাইনোসিস

১০. কোন গোলার্ধের দেশগুলোতে গমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে?

ক. দক্ষিণ
খ. উত্তর
গ. পূর্ব
ঘ. পশ্চিম

১১. 'পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি' নামে আখ্যায়িত কোন অঞ্চল?

ক. চীনের ইয়াংসী
খ. রাশিয়ার সাইবেরিয়া
গ. উত্তর আমেরিকার প্রেইরি তৃণভূমি
ঘ. পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ

১২. আখের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

ক. Saccharum officinarum
খ. Triticum aestivum
গ. Oryza Sativa
ঘ. T. dicioccum

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১৩. আখ কোন অঞ্চলের ফসল?

ক. উষ্ণমণ্ডল খ. হিমমণ্ডল গ. শীতপ্রধান ঘ. নাতিশীতোষ্ণ

১৪. আখ চাষের জন্য জমিতে প্রচুর পরিমাণে কোন সার প্রয়োগ করতে হয়?

ক. নাইট্রোজেন খ. সালফার গ. পটাশিয়াম ঘ. ইউরিয়া

১৫. চা কোন অঞ্চলের উদ্ভিদ?

ক. ক্রান্তীয় খ. নাতিশীতোষ্ণ গ. মৌসুমি ঘ. মৃদু উষ্ণ নীতিশীতোষ্ণ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – কৃষি

টপিক – ১২ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

একটি খাদ্যশস্য যা উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় বলে তাকে 'পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি' বলা হয়। তবে চীন হচ্ছে শস্যটির প্রধান উৎপাদনকারী দেশ।

[ঢা. বো., দি. বো. ২০২৩]

ক. ব্যাপক কৃষি কাকে বলে?

খ. বাংলাদেশের পাটকে সোনালি আঁশ বলা হয়- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শস্যটি, উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক নিয়ামক ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শস্যটির বিশ্ববাণিজ্যে দেশ দু'টির ভূমিকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ইন্দোনেশিয়ার তুন আব্দুল গাফফার বাংলাদেশের সিলেটে বেড়াতে এসে একটি ফসলের সবুজে শোভিত বড় বড় বাগান দেখে অভিভূত হলেন। তিনি আরো জানতে পারলেন যে তাঁর দেশে অধিক উৎপাদিত ফসলটি বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলাতেই কম বেশি উৎপাদিত হয়।

[ঢা. বো., দি. বো. ২০২৩]

ক. শিল্প কাকে বলে?

খ. "কাঁচামালের সহজলভ্যতা সিমেন্ট শিল্প গড়ে উঠার অন্যতম নিয়ামক"- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দ্বিতীয় ফসলটি চাষের ভৌগোলিক নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ফসল দু'টির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং নদী বিধৌত দেশটি ধান উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। প্রাকৃতিক বিভিন্ন নিয়ামকের অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকার কারণে আমরা প্রচুর ধান উৎপন্ন করলেও অত্যধিক জনসংখ্যার কারণে চাহিদা পূরণে আমাদের ধান আমদানি করতে হয়।

[রা, বো,, কু. বো, ড. বো.. ব. বো. ২০১৮]

ক. BRRI এর পূর্ণরূপ লেখো।

খ. প্রেইরি অঞ্চলকে পৃথিবীর বুটির ঝুড়ি কেন বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দেশটির ধান উৎপাদনের প্রাকৃতিক নিয়ামক ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের দেশদ্বয়ের ধান উৎপাদনের তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU